প্রায়শ্চিত্ত

তপন গোস্বামী

সকাল থেকে ধূপের গন্ধে বাড়িটা ম'ম করছে। সুধাময়ী বুঝতে পারে ধুনোর গন্ধও মিশেছে খানিকটা। এমনিতে চুপচাপই থাকে বাড়িটা। আজ অবশ্য অনেকেরই গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে পুরোহিতের গলাটাই বেশি স্পষ্ট। বেশ বুঝতে পারা যায়, আয়োজনে কোথাও খুঁত রাখতে তিনি রাজি নন। সুধাময়ীর ছেলেরাও অবশ্য আযোজনের ত্রুটি রাখতে চায় না। দ্বাদশ ব্রাহ্মণের জায়গায় নিমন্ত্রিতের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। নিকট আত্মীয়রা তো এসেইছে। দূরের সম্পর্কেরও দু-চারজন এসেছে। আর আসবে না-ই বা কেন। সুধাময়ী কী কাউকে কম ভালোবেসেছেন! সাধ্য মতো কারো বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াতে তিনি কসুর করেননি। যতদিন পেরেছেন নিজের হাতে তিনি ভিখারিকে ভিক্ষে দিয়েছেন। ওদের মুখে মা-ঠাকরুন ডাক শুনতে তাঁর বড়ো ভালো লাগত।

রান্নাঘরের টিনের চালে রোদ ক্রমশ চড়া হয়ে উঠেছে। সেই কোন ভোরে উঠেছেন সুধাময়ী। আজকাল ভোররাতে পাখিদের ডাকাডাকি শুরু হলে তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর সব সময়ের সঙ্গী নীলুর মায়ের সাহায্যে বিছানা থেকে নেমে পড়েন। তারপর প্রাতকৃত্য সেরে বারান্দায় গিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে পড়েন। যতক্ষণ পারেন এভাবেই বসে বসে তিনি দেখেন কেমন করে চরাচর ফর্সা হয়ে যায়, আলো ফুটে ওঠে চতুর্দিকে। স্বাস্থ্যসচেতন দু-চারজন পথচারী ছাড়া রাস্তা তখন শুনশান। আজকাল আর ভোরবেলা কোনো ছেলেমেয়ের পড়ার শব্দ শোনা যায় না। তারা নাকি রাতে পড়ে, সকালে ঘুমোয়। সুধাময়ীর নাতি-নাতনিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। বড় ছেলে ঠাট্টা করে বলে, 'মা এই জেনারেশনে সূর্যোদয় নেই'। কিন্তু এই নব্বই বছর বয়সেও সুধাময়ীর দেখতে ভালো লাগে কেমন করে চোখের সামনে চরাচর জেগে ওঠে। ফুল ফুটে ওঠার মতো শব্দ ফুটে ওঠে তখন এ পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে। বাথরুমে পড়ে পা ভাঙার পর থেকে গত দশ বছর সকাল আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত এটাই সুধাময়ীর প্রতিদিনের রুটিন।

আজ অবশ্য আলাদা রুটিন। সকালেই স্নান সারা হয়ে গেছে, পরনে পাটভাঙা নতুন কাপড়। বাড়ির লোকজনও আজ খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। ইতিমধ্যেই মাকে প্রণাম করে গেছে ছেলে-মেয়ে-বৌমা-জামাই এবং নাতি-নাতনিরা। মেয়ে আবার মায়ের কপালে একটা চন্দনের টিপ পরিয়ে দিয়ে গেছে। না, আজ সুধাময়ীর চা খাওয়া বারণ, অন্যান্য

খাবারও সেই পুজোআর্চার পরে। কিন্তু যে চড়ুইগুলো রোজ বিস্কুটের গুঁড়ো খেতে আসে, তারা শুনবে কেন! ভারী কিচিরমিচির লাগিয়েছে তারা।

সেদিন বড়ো ছেলে যখন এসে বলল, 'মা আগামী সোমবার ১৬ তারিখ তোমার প্রায়শ্চিত্তের দিন ঠিক করলাম', তখন সুধাময়ী খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত—এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আচরণটি যে সুধাময়ীর অপরিচিত, তা নয়। বৃদ্ধ বয়সে রোগে যন্ত্রণায় যারা খুব ভোগেন, যারা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি চান, অথচ মৃত্যু আসে না, তারা মনে করেন এ জন্মের পাপের কারণে ভগবান তাকে মুক্তি দিচ্ছেন না। তাই প্রায়শ্চিত্তের বিধান। এই প্রায়শ্চিত্ত নামক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ,পাপ মুক্ত হলে মৃত্যু আসে মুক্তিদূত হয়ে। তাই বাড়ির লোকেরা উদ্যোগী হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। বয়সজনিত কারণে সুধাময়ীর কিছু অসুবিধা আছে ঠিকই, নীলুর মায়ের সাহায্য ছাড়া তিনি বাথরুমেও যেতে পারেন না, ভালো ঘুম হয় না, মাঝে মাঝে হাঁপানিতেও কষ্ট পান, গ্যাস অম্বল তো আছেই; মুখে দু-একবার বলেওছেন, 'মরণ হলেই বাঁচি', তবু মনে প্রাণে তিনি কোনদিন মৃত্যু প্রার্থনা করেননি। এখনো অনেক টান, শিকড়ে-বাকড়ে এখনো অনেক মায়া। সূর্যোদয়ের টানে এখনো তিনি অশক্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যান বারান্দায়। ছোট নাতিটার স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে উৎকণ্ঠিত সুধাময়ী বারবার খবর নেন, বড়ো ছেলের সাথে বৌমার ঝগড়া হলে মন খারাপ হয়ে যায় সুধাময়ীর। নীলুর মায়ের কাছে পাড়ার লোকেদের খবরাখবর নিতে সুধাময়ীর বড়ো ভালো লাগে, মাঝে মধ্যে টিপ্পনীও কাটেন। এখনো তীব্র অভিমান, এখনো কারো দুঃখের কথা শুনলে ছলছল করে ওঠে দু-চোখ। এই সংসার থেকে এখনো তার পা তো উঠে যায়নি যে দেহ তোলার কথা ভাববেন। তাই বড়ো ছেলের কথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন সুধাময়ী। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। সত্যিই তো ছেলের আর দোষ কোথায়! মেঘে মেঘে নব্বই পেরিয়ে গেছেন তিনি। ইতিমধ্যে স্বামী মারা গেছেন, ছোট ছেলেও এক পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তো তাঁর মনে বৈরাগ্য জেগে উঠবার কথা। পড়ন্ত রোদের পরকালের প্রতি টান থাকবারই তো কথা। ছেলে কেন, যে কেউ ভাববে, সুধাময়ী হয়তো মুক্তি বাসনায় ব্যাকুল, কিন্তু মৃত্যু দূরে দাঁড়িয়ে পা ঘষছে। মায়ের এই বাঁধন কেটে দিতে হবে, তাহলেই মা মুক্তি পাবে। তাই প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন। যদি কিছু পাপ থাকে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতার আশীর্বাদে তা থেকে মায়ের মুক্তি ঘটবে, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ মায়ের শোকসন্তপ্ত জীবনে শান্তি এনে দেবে ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এরকম ভাবনাই তো স্বাভাবিক। প্রসন্ন হেসে সুধাময়ী সম্মতি দিয়েছিলেন।

আজই সেই সোমবার। আত্মীয় কুটুম্ব গমগম করছে বাড়ি। সকাল থেকেই বক্সে বাজছে একটা গান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারবার—হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে। যাক, অনেকদিন পরে এ বাড়িতে একটা উৎসব—মৃদু হাসি ফুটে উঠল সুধাময়ীর মুখে। 'ওঠো গো দিদি, এবার তোমার ডাক পড়েছে'— নীলুর মা সন্তর্পণে হাতটা ধরে। সুধাময়ীর নীচে

নামতে কষ্ট হবে বলে ওপরের টানা বারান্দায় আয়োজন হয়েছে পুজোর। পা ভাঙার পর থেকে নীচে পা মুড়ে বসতে পারেন না সুধাময়ী, তাই চেয়ারের ব্যবস্থা। পুরোহিত নীচে বসেছেন বলে একটু অস্বস্তি হয়, কিন্তু কী আর করা যায়। চারিদিকে রাশিকৃত ফলফুল, মাঝে গৃহদেবতা নারায়ণের বিগ্রহ আর গুরুদেবের ছবি। অনেকেই চারদিকে গোল হয়ে বসে আছে, সুধাময়ীর প্রায়শ্চিত্ত দেখবে। 'মা শরীর খারাপ লাগছে না তো?' বৌমার গলা। সুধাময়ী 'না' বললেন। আচ্ছা, বৌমার মুখে কি মিচকে হাসি লেগে আছে? নাহ্, সুধাময়ীর দেখার ভুল। বৌমার সঙ্গে তো তাঁর সম্পর্কে কোনদিন চিড় ধরে নি। সুধাময়ীর গলাটা কী রকম শুকিয়ে আসে। ঠাকুরমশাই বললেন, 'মা এবার কাজ শুরু করি। আপনি গুরুকে প্রণাম করে গোবিন্দের চরণে মনোনিবেশ করুন। নিন গঙ্গাজলে একটু হাতটা ধুয়ে নিন।' পুরোহিত কাজ শুরু করলেন। আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘট-স্থাপন, পঞ্চগোব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি—বেলা ক্রমশই বাড়ছে। রান্নাচালার পাশে কাকেদের ঝগড়া বেশ জমে উঠেছে। আচ্ছা মায়ের সঙ্গে স্কুল যাবার সময় আজকেও কি পাশের বাড়ির ছেলেটা খুব কান্নাকাটি করছিল? ছোটছেলের কান্নায় বিচলিত হন সুধাময়ী। নাতনির ছেলে, সবে ছ'মাস হয়েছে। ওর মা খুব ভুলো। নিশ্চ'ই দুধ খাওয়াতে ভুলে গেছে। আশপাশে চোখ মেলে সুধাময়ী মেয়েকে খোঁজেন। তারপর বলেন, 'তোরা কী করিস। দেখতে পাস না ছেলেটা খিদেয় কাঁদছে'। বিরক্ত মেয়ে মাকে ধমক দেন, 'তুমি পুজোয় মন দাও মা। এদিকে তোমাকে মন দিতে হবে না।'। লজ্জিত সুধাময়ী মনে মনে ক্ষমা চান গোবিন্দের কাছে। মন এত বিক্ষিপ্ত হলে পাপের বাঁধন কী করে কাটবে। চোখ বুজে গুরুদেবের মুখটি স্মরণ করার চেষ্টা করেন সুধাময়ী। পুজো এগিয়ে চলেছে। ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা-ন্যাসাদির পরে এবার পাদপদ্মে অর্ঘ্য স্থাপন। ঠাকুরমশাই বললেন, 'মা, এবার মনে মনে স্মরণ করুন কী কী পাপ আপনি করেছেন। তারপর সেগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে গোবিন্দের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করুন'। পাপ? সুধাময়ী চোখ বোজেন। স্মৃতি হাতড়ে আকুপাকু করে খোঁজেন পাপ। কোথায় পাপের সেই কালো মূর্তি? ছোটবেলায় বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি মারামারি করা, মাকে লুকিয়ে বিস্কুটের কৌটো কিংবা ফ্রিজ থেকে দু-চারবার খাবার খাওয়া, দু-চারটে নিতান্ত নিরীহ মিথ্যে কথা বলা, কিংবা দুষ্টুমি করলে ছেলে-মেয়েকে শাসন করা—এগুলো কী পাপ? এসব তো জীবনের অঙ্গ। যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ—সবার জীবনেই তো এসব ঘটেছে। কই তাঁদের তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি, মৃত্যু তাঁদের দরজায় কড়া নাড়তে তো দেরি করেনি। সুধাময়ী আরো গভীরভাবে মনের অতলে তন্ন তন্ন করে পাপ খুঁজতে থাকেন। বাতাসে লুচিভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, দু-চারজন করে নিমন্ত্রিতরাও আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ পুরোহিতের মন্ত্রধ্বনি ছাপিয়ে সুধাময়ীর কানে পৌঁছায় পাঁচুর গলা। ছোটছেলের বন্ধু। দুর্ঘটনায় পড়া সেই গাড়িতে ছেলের সঙ্গে পাঁচুও ছিল। পাঁচু প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা পা তার কাটা যায়। ক্রাচ নিয়ে খুব কষ্ট করে একপায়ে হাঁটে। হঠাৎ ছোটছেলের জন্য বুকটা

খাঁ খাঁ করে সুধাময়ীর। দলাপাকানো একটা কষ্ট, গলার নীচেটা ব্যথা ব্যথা করে। আচ্ছা, সুধাময়ী মরে গেলে ছোটছেলের বৌকে এরা দেখবে তো? পুরোহিত তাড়া দেয়—'মা, তাড়াতাড়ি করুন।' হ্যাঁ, আর দেরি হবে না। এতক্ষণে সুধাময়ী তার পাপকে দেখতে পেরেছে। নব্বই বছর বয়সে সংসারে এই আসক্তি তার পাপ। লতায় পাতায় রোদে বৃষ্টিতে এই ভালোবাসা তার পাপ। সূর্যাস্তের দিকে যেতে যেতে সূর্যোদয়ের দিকে এমন সতৃষ্ণ নয়নে তাকানো তার পাপ। এখন তো তার সুখে দুঃখে বিগতস্পৃহ হয়ে সবসময় গোবিন্দের চরণ ধ্যান করা উচিত, সকাল-সন্ধ্যা গুরুমন্ত্র জপ করা উচিত। তাহলে বাগানে কী কী ফুল ফুটলো, দক্ষিণের জমিতে এবার আলুর ফলন কেমন, গলির কোণের বাড়িটায় হঠাৎ রঙ করা হচ্ছে কেন—এসব খবরের জন্য সুধাময়ীর এখনও কৌতূহল কেন? পাপ, এই পাপেই সুধাময়ীর মুক্তি ঘটছে না। সুধাময়ী চোখ বুজে বলেন। 'হে গোবিন্দ, আমার এই পাপের বাঁধন কেটে দাও, হে সর্বপাপহর, এই কৌতূহল, এই অভিমান তুমি বিনাশ কর, না হলে যে আমার মুক্তি ঘটবে না।' পুরোহিত সুধাময়ীর হাতে ফুল-বেলপাতা দিলেন। সুধাময়ী সে অঞ্জলি অর্পণ করতে করতে পুরোহিতের শোখানো মন্ত্র পড়েন—

পাপোহইহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ! সর্বপাপহরো হরিঃ॥

আর কী জানি কেন, সুধাময়ীর দু-চোখ বেয়ে নেমে আসে মোটা জলের ধারা।